Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage: https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Original Research

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্রমবিকাশ (১৮৬১-১৯৭২)

মোঃ আলী আজম খান[১]*

[১]রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪
* Corresponding Author: মোঃ আলী আজম খান, ই-মেইল : drazamkhan1970@gmail.com; মোবাইলঃ +৮৮০১৮৭১০৫৭৭৩৫
Received: 06/02/2024; Accepted: 09/08/2024; Online available: 30/09/2024

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি সংসদীয় গণতন্ত্র। (Parliamentary democracy) স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলেও ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তার রহিতকরণ করা হয়। ১৯৭৫ পরবর্তী সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে সামরিক শাসন ও সেনা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা বহাল ছিল ১৫ বছর। ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে জেনারেল এরশাদের পতন হলে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে সচেতন নাগরিকগণ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে নেতিবাচক প্রশ্ন রয়েছে। জাতীয় সংসদ কেন্দ্রিক নানাবিধ গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফলেও সংসদের অকার্যকারিতার চিত্র ফুটে উঠেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের উন্মেষকাল উদঘাটনের এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং এর ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, ব্রিটিশ আমলে ১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতে সর্বপ্রথম আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনের বিধান বলে বাংলায় ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাদেশিক আইন সভা গঠিত হয়। এই আইন সভায় ৪ জন বেসরকারি বাঙালি সদস্য ছিলেন এরা হলেন : নবাব আব্দুল লতিফ, রাজা রাম প্রসাদ রায়, রাজা প্রতাপ চন্দ্র এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ১৮৯২ সালে ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট এবং ১৯০৯ সালের মর্লিমিন্টু সংস্কার আইনে ও আইন সভার অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯১৯ সালের আইনে কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং প্রতিটি প্রদেশের জন্য একটি করে এককক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২০, ১৯২৩, ১৯২৬ এবং ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইন সভার চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদে নির্বাচিত সদস্যরা কৃষক, শ্রমিক ও রাজবন্দীদের উপর সরকারের নির্যাতন এবং তাদের মুক্তির বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। ১৯৩৫ সালের আইনে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়। এ আইনে কেন্দ্রের ন্যায় প্রদেশেও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থ হলে ১৯৫৪ সালে ২৫ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রথম গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ মারিচুক্তির ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রণয়ন করে। এই সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গৃহিত হলেও কেন্দ্রিয় সরকারের হস্তক্ষেপে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন এবং সামরিক শাসন জারি ও রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে ২৩শে মার্চ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ গণপরিষদ অধ্যাদেশ জারি করেন। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে আইনসভার সূচনা ঘটে। ১৯৭২ সালে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন হলেও সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়। এই গবেষণায় মূলত সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্রমবিকাশের ধারায় নানাবিধ বাধা বিপত্তিগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল শব্দ সূচক : সংসদীয় গণতন্ত্র, বঙ্গীয় আইনসভা, কেন্দ্রিয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার, স্বায়ত্তশাসন, দায়িত্বশীলতা, বিরোধীদল, সরকারি দল, নির্বাচন, সামরিক শাসন

ভূমিকা

বাংলাদেশে স্বাধীনতা-উত্তরকালে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা গৃহিত হয়। সংবিধানের পঞ্চমভাগের প্রথম পরিচ্ছেদের ৬৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “জাতীয় সংসদ” নামে বাংলাদেশে একটি সংসদ থাকিবে এবং এই

© Journal of Gono Bishwabidyalay All Rights Reserved

সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে ১৯৭২ সালে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হলেও ১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় [১]। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে সামরিক শাসনের আবির্ভাব ঘটলে সেনাশাসক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রেসিডেন্ট এরশাদের সামরিক শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় দেশ পরিচালিত হয় ১৫ বছর। ১৯৯১ এর স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনে প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতন হলে ১৯৯২ সালে ৬ আগস্ট সরকার ও বিরোধী দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে [১]। ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা গণতন্ত্রের পরিভাষায় বলা যায় যে, সহনশীলতা ও সহযোগিতামূলক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। দ্বাদশ সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে অক্ষুণ্ন থাকেনি। পঞ্চম জাতীয় সংসদের মধ্যবর্তীকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক চরমভাবে বিরোধিতামূলক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। যা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। সরকার ও বিরোধীদলের এরূপ পারস্পরিক বিরোধিতামূলক সম্পর্কের অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্তে, বাংলাদেশে প্রচলিত সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় এবং বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮৬১ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সংসদ প্রতিষ্ঠার উন্মেষ এবং এর ধারাবাহিক ক্রমবিকাশমান পর্যায়সমূহে সংসদে সরকার ও বিরোধীদলের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া পাকিস্তান আমলে ১৯৫৬ সালে সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন, সরকার ও বিরোধীদলের সম্পর্ক, সামরিক শাসন জারি, সংসদীয় পদ্ধতি বাতিল ও রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা কায়েম, সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যকারিতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা ও রহিতকরণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণসমূহ এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন

১) বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রচলিত সংসদীয় গণতন্ত্রের উন্মেষের অন্তর্নিহিত কারণ কী?
২) সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশমান ধারায় সরকার ও বিরোধীদলের আন্তঃসম্পর্ক কী রূপ ছিল?
৩) সংসদীয় গতন্ত্রের বিকাশে বিঘ্নসৃষ্টিকারী সেনাশাসনের প্রভাব কী রকম?

গবেষণার উদ্দেশ্য

১) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বিদ্যমান সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্রমবিকাশমান ধারা নির্ণয় করা।
২) ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ পর্যায়ের ক্রমবিকাশমান ধারায় সরকার ও বিরোধীদলের পারস্পরিক সম্পর্কের তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরা।
৩) বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের সুদীর্ঘ পরিক্রমায় সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় করা।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিক পর্যায় বিশ্লেষণের জন্য গুণধর্মী গবেষণা হিসেবে গণ্য হবে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংখ্যাতাত্ত্বিক ডাটা, টেবিল, সারণী যুক্ত করা হয়েছে।

ব্রিটিশ পর্ব

১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একশত বছর পর ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ (প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ) সংঘটিত হয়। ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাঙালি সৈনিকরা এই বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিল। সমকালীন ইতিহাসবিদগণ, ইউরোপীয় সিভিলিয়ান, রাষ্ট্রনায়ক এবং লেখকগণ সিপাহী বিদ্রোহের কারণ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে Thomas Metcalf-এর অভিমত হচ্ছে, "Something more than a Sepoy Mutiny, but something less than a national revolt" [২] সিপাহী বিদ্রোহের কারণ যাই হোক না কেন, এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ১৮৫৮ সালে এক ঘোষণা বলে ভারতবর্ষে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেন। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি শাসন জারি হওয়ার পর বৃটেনের অনুকরণে আইনসভার উদ্ভব ঘটে। এর আগে ১৭৭২ সালের 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' এবং ১৭৮৪ সালের 'পিট্স ইন্ডিয়া এ্যাক্ট'কে আইন সভা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হিসেবে

চিহ্নিত করা হয়। এ আইনে ভারতের জন্য একজন গভর্ণর জেনারেল ও তার একটি নির্বাহী পরিষদ (Executive Council)-এর ব্যবস্থা করা হয় [২]। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এই আইনটি ছিল ভারতে প্রথম নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতে প্রথম আইনসভা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আইনের বিধান বলে বাংলার জন্য ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাদেশিক আইনসভা গঠিত হয়। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর ছিলেন এর সভাপতি। ১২ জন মনোনীত সদস্য ছিলেন। এদের মধ্যে ৪ জন বেসরকারি বাঙালি সদস্য। বাঙালি সদস্যবৃন্দ হলেন, নবাব আব্দুল লতিফ, রাজা রামপ্রসাদ রায় (রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ ছেলে), রাজা প্রতাপচন্দ্র (বর্ধমানের জমিদার) এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর (দ্বারকানাথ ঠাকুরের চাচাতো ভাই) [৩]।

১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নির্বাহী পরিষদ এবং আইনসভার উভয় ক্ষেত্রে সরকারি সদস্যদের প্রাধান্য ছিল। ব্রিটিশ সরকারের অনুগত ভারতীয়দের বেসরকারী সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হত। এই আইনে গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের কারণে আইনসভাগুলো নির্বাহী পরিষদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটিতে পরিণত হয়। প্রথম বঙ্গীয় আইনসভায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের কোনো কার্যকারিতা ছিল না। কারণ আইনসভার প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত ছিলেন না। তারা ছিলেন গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত। ১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রতিফলন না ঘটলেও এই আইনের মাধ্যমেই ভারতীয়রা প্রথমবারের মত সংসদীয় অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কাজে সংশ্লিষ্ট হয়।

১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট আইনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির প্রচলন এবং সংসদে প্রশ্ন করার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। এই আইন অনুযায়ী ১৮৯৩ সালে বঙ্গীয় আইনসভা গঠিত হয়। এ আইনসভার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী সিরাজুল ইসলাম, মৌলবী আব্দুল জব্বার, আনন্দ মোহন বসু, নাটোরের জগদীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ [৩]। ১৮৯২ সালের আইনে সদস্যগণ প্রশাসনিক বিষয়সহ বাজেট নিয়ে প্রশ্ন করতে পারতেন তবে তাদের কোনো ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন যে, "There still remained an official majority on the councils and there was still no approach to a parliamentary system" [৩]।

ভারতীয় আইনসভার ক্রমবিবর্তনে ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে আইনসভার সদস্যরা বাজেট বা অর্থ বিল নিয়ে আলোচনা করার অধিকার লাভ করে। এছাড়া একমাত্র বৈদেশিক সম্পর্ক ও দেশীয় রাজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত জনস্বার্থ সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে তারা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারতেন। এই আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা হয়। মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মধ্যে দিয়ে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পারিক সহ অবস্থানের একটি প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষে পর্যায়ক্রমে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন পাশ করে। ১৯১৯ সালের আইনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় গভর্ণর জেনারেলের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সরকারি ঋণ, অর্থ বা রাজস্ব, ধর্ম, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে কোনো বিল উত্থাপনের ক্ষমতা ছিল না। নতুন এ আইনে সকল প্রদেশের জন্য একটি করে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া প্রাদেশিক আইনসভার গঠন কাঠামো ও সম্প্রসারণ করা হয়। নির্বাচিত, সরকারি এবং বেসরকারি এই তিন ধরনের সদস্য নিয়ে এ আইনসভা গঠিত হয়। এ আইনে বিধান করা হয় যে, সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ নির্বাচিত এবং বাকিরা মনোনীত হবেন। দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। তবে রাষ্ট্রের যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন এবং প্রাদেশিক সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল [৪]। মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্যদের মধ্যে থেকে গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। তারা আইনসভায় এক অর্থে দায়ী ছিলেন। গভর্ণর সাধারণত মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে তাদের পরামর্শ তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন। সীমিত আকারে ভোটাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বেসরকারি আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল এই আইনের উল্লেখযোগ্য দিক।

বাংলা প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অধীনে যথাক্রমে ১৯২০, ১৯২৩, ১৯২৬, ১৯২৯ সাল পর্যন্ত চারটি বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত নির্বাচনকালীন সময়ে অসহযোগ, খেলাফত ও আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। এইসব আন্দোলনের কারণে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ১৯২০ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন বর্জন করলে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯২৩ সালের বঙ্গীয় আইনসভায় স্বরাজবাদী এবং মুসলিম লীগ যথাক্রমে প্রধান এবং ২য় সংসদীয় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৬ এবং ১৯২৯ সালে ৩য় এবং ৪র্থ আইনসভায় স্বরাজপন্থীরা তাদের নিজস্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ন রাখে। আইন পরিষদে স্বরাজপন্থীরা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পন্থা গ্রহণ করেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপকে সমর্থন প্রদান এবং আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন [৪]। বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যদের আলোচনায় যেসব বিষয় গুরুত্ব পায় তা হলো কৃষক, শ্রমিক ও রাজবন্দীদের উপর সরকারি নির্যাতন, রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি। বঙ্গীয় আইনসভায় সংসদীয় কার্যক্রমে

সদস্যদের অধিকার সম্পর্কে *Nizam Ahmed Gi The Parliament of Bangladesh* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "Members were allowed freedom of speech and vote. They also enjoyed immunity for whatever they said or the way they voted in the council. No member was liable to proceedings in any court for his speech or vote in the chamber or for anything published in any official report of the proceedings of the council. Members were given the right to ask questions and to move bills, resolutions and adjournment motions" [১৬]। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আইনসভায় সদস্যদের ভোটে মন্ত্রীদের বেতন বিল, Criminal Law Amendment Bill নাকচ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। কখনো মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত ও তা গৃহীত হয় [৩]। এ ধরনের গঠনমূলক সংসদীয় কার্যক্রম পর্যায়ক্রমিকভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যগণও বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ থেকে দাবী দাওয়ার ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ১৯২১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রায় যদুনাথ মজুমদার আইন পরিষদে উত্থাপিত এক প্রস্তাবে প্রথম কাউন্সিলের মেয়াদ শেষ হবার পরপরই প্রদেশগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং কেবলমাত্র সেনাবাহিনী ও বৈদেশিক দপ্তর ব্যতীত সকল কেন্দ্রীয় বিভাগ জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ন্যস্ত করার দাবী জানান। ১৯২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি দেওয়ান বাহাদুর রংগচরিয়ার সংস্কার সাধনে ভারত সচিবের অস্বীকৃতিতে নিদারুণ ক্ষোভ ব্যক্ত করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বেশ কিছুটা বিশদ আলোচনার পর প্রস্তাবটি মূলতবী থাকে। হরি সিং গৌর ১৯২৩ সালের ১৮ জুলাই আরেকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবে সংবিধানের আওতায় অধিকতর সংস্কার পরিচালনার ব্যাপারে ভারত সচিব প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান হয়। ঐ প্রস্তাবটি ৪৩-৩০ ভোটে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অনুমোদিত হয় [৪]।

১৯১৯ সালের আইনে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে সরকার ও বিরোধী দলের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দ্বৈত শাসনের মাধ্যমে প্রদেশে আংশিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা গভর্ণর কেন্দ্রীক হওয়ার ফলে তা কার্যকরী হয়নি। প্রতিনিধিত্বশীল সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত বিরোধী দল এবং মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতা। এই আইনে এসব বিষয় লক্ষ্য করা যায় না। ১৯১৯ সালের আইনে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইনসভায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক কার্যকর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও সংসদীয় দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এটি ছিল সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালের আইনে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিধান রেখে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আইনে কেন্দ্র ও প্রদেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা হয়। এই আইনে মন্ত্রীবর্গ তাদের কাজের জন্য প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী ছিলেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ, মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করা ছিল এই আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য [২]।

১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেল কেন্দ্রীয় আইনসভার যে কোনো অধিবেশন আহ্বান করতে এবং স্থগিত রাখতে পারতেন। এমনকি নিম্নকক্ষ ভেঙ্গে দিতে পারতেন। কোনো বিলে সম্মতি দান করা বা না করা তার সম্পূর্ণ ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। পুনর্বিবেচনার জন্য তিনি বিল আইনসভায় ফেরত পাঠাতে পারতেন। যে কোনো বিলে 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা তার ছিল। তার সম্মতি ব্যতীত কোনো বিল আইনে পরিণত হতো না। অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে তিনি আইন পাশ করতে পারতেন। কতিপয় বিষয়ে বিল উত্থাপনের জন্য তার পূর্ব অনুমতি আবশ্যক ছিল। প্রয়োজনে তিনি প্রদেশের উপর তার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। এবং বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার অধিকার তার ছিল [৩]।

১৯৩৫ সালের আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হলেও কেন্দ্রীয় গভর্ণর জেনারেলের ন্যায় প্রাদেশিক গভর্ণর ও একই রকম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি আইনসভার নিকট দায়ী না থেকে ব্রিটিশ সরকারের নিকট দায়ী থাকতেন। আইনসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা, মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্যবাধকতা না থাকা, মন্ত্রীসভা বাতিল করে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন, সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলে ভেটো প্রদান, বিল পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো এবং অর্ডিন্যান্স জারী করার ক্ষমতা তার ছিল [৩]।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী ফলাফলে কংগ্রেস ৫২, স্বতন্ত্র হিন্দু ৩৯, হিন্দু ন্যাশনালিস্ট ৩, হিন্দু মহাসভা ২, স্বতন্ত্র মুসলিম ৪৩, লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড ৩৯, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬, তিপেরা কৃষক সমিতি ৫, ইউরোপিয়ান গ্রুপ ২৫, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ৪ এবং ইন্ডিয়ান খৃস্টান ২টি আসন লাভ করে [৫]। কংগ্রেস এককভাবে সর্বাধিক আসন লাভ করলেও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি।

নির্বাচনের পর সরকার গঠনের অভিপ্রায়ে কিছু স্বতন্ত্র মুসলিম সদস্য মুসলিম লীগে এবং কিছু কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দান করে। এক্ষেত্রে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা হয় ৬০ এবং কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য সংখ্যা ৫৮-তে পৌছায়। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম

লীগ এবং কৃষক প্রজা পার্টি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করে। এই মন্ত্রীসভায় মুসলিম লীগ দলীয় মন্ত্রী ছিলেন, খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ, নবাব মোশাররফ হোসেন, কৃষক প্রজা পার্টির এ. কে. ফজলুল হক এবং সৈয়দ নওশের আলী, স্বতন্ত্র হিন্দু সদস্য নলিনী রঞ্জন সরকার, শ্রীশ চন্দ্র নন্দি, বি. পি. সিং রয়, সিডিউল কাস্টের প্রসন্ন দেব রাইকাত এবং মুকুন্দ বিহারী মল্লিক। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক এই মন্ত্রীসভায় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন [৬]। বঙ্গীয় আইন সভার এই নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে রাজনীতিতে সরকার ও বিরোধীদলের পারস্পরিক সহ অবস্থান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সরকার ও বিরোধী-দলের এরূপ পারস্পরিক সহ অবস্থান উপমহাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বঙ্গীয় আইনসভার দ্বিতীয় নির্বাচন ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এটিই ছিল ব্রিটিশ শাসনের শেষ নির্বাচন। নির্বাচনী ফলাফলে মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কংগ্রেস পায় ৮৬টি আসন।

১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল বাংলায় সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করে। এ সময়ে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য এবং মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে অনঢ় ছিল। কিন্ত কংগ্রেস অখন্ড ভারতের স্বাধীনতা দাবী করলেও ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠির ন্যায্য দাবি আদায়ে নির্লিপ্ত ছিল। সে কারণেই মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র আবাসভূমি বির্নির্মাণে সোচ্চার হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা আন্দোলনের এইরূপ পরিস্থিতিতে লর্ড Mountbatten তার পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭-এর জুন মাসে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন Bengal Legislative Assembly অধিবেশন আহ্বান করা হয়। Mountbatten-এর পরিকল্পনাটি বঙ্গীয় আইনসভায় ১২৬-৯০ ভোটে গৃহীত হওয়ার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতে উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। একই সাথে বঙ্গীয় আইনসভার বিলুপ্তি এবং ভারত, পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে [৬]।

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে এ অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে সংসদীয় কাঠামোর প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমবিকাশ ঘটে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ও প্রসারিত হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশের সংসদীয় কাঠামোগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে জনপ্রতিনিধিত্বের ধারক না হলেও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সাধারণ নির্বাচন এসব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় আইনসভার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংসদীয় বিতর্কে কেন্দ্রীয় আইনসভার চেয়েও বঙ্গীয় আইনসভা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার পরেই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আইনসভা প্রবর্তিত হয়। বঙ্গীয় আইনসভাই ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা করে [৪]। কেন্দ্র ও প্রদেশের নির্বাহী বিভাগের গভর্ণর জেনারেলও গভর্ণর ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩৭-১৯৪৭ পর্যন্ত সময়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধীনে বঙ্গীয় আইনসভায় সংসদীয় রীতি নীতি চর্চার সুযোগ ঘটে। এই সময়ে আইনসভায় সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যগণ তর্ক-বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর ও বিলের উপর অর্ধ ঘন্টাব্যাপী আলোচনায় অংশ নেন। আইনসভার আলোচনায় বেসরকারী সদস্যদের অগ্রাধিকার ছিল [৬]। উল্লেখ্য যে, ১৯২১ সালের প্রথম ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্যগণ সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত উভয় বিষয়ে ৩১৪টি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এ সময়ে বিরোধী দলের নেতৃত্বে ছিলেন কিশোরী মহন চৌধুরী এবং সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক। ১৯২৭ সালের তৃতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যা ছিল ১০০০-এর বেশী। প্রশ্নের বিষয় ছিল প্রশাসন, দাঙ্গা এবং রাজবন্দী। মোট ৩০৯টি প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও আলোচিত হয়েছে মাত্র ৪০টির। ১৯২৯ সালের চতুর্থ ব্যবস্থাপক সভায় রাজনৈতিক এবং সরকারি নীতি সংক্রান্ত ৪০৬০টি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১১৮টি প্রস্তাব আলোচিত হয় [১৭]। উপনিবেশিক আমলে বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হলেও সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলো দায়িত্বশীল সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ থেকে জবাবদিহিমূলক কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে গেছেন।

পাকিস্তান পর্ব

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানে প্রথম গণপরিষদ গঠিত হয়। প্রথম গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৯। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল ৪৪ (পাঁচজন অবাঙালি সদস্যসহ)। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন গণপরিষদের সভাপতি। তিনি মারা যাওয়ার পর (সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) মৌলভী তমিজউদ্দিন খান গণপরিষদের সভাপতি হন। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট করাচিতে গণপরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হিসেবেও কাজ করবে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রথম গণপরিষদে সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি 'আদর্শ প্রস্তাব' নামে পরিচিত। আদর্শ প্রস্তাবে ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়নের কথা বলা হলে, সংখ্যালঘুরা সাংবিধানিক বৈষম্যের কথা বলে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানান। এর ফলে লিয়াকত আলী খানের আদর্শ প্রস্তাবটি সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্যতা হারায় [৩]।

সংবিধানের মৌলিক বিষয় নির্বাচনের জন্য ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি মূলনীতি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে মূলনীতি কমিটির প্রথম রিপোর্ট পেশ করেন। দ্বিতীয় মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর। এবং তৃতীয় মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী কর্তৃক ১৯৫৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট পেশের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব, আইনসভার উভয় কক্ষের ক্ষমতা ইত্যাদি প্রশ্নে পূর্ববাংলায় চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পাকিস্তানের উভয় অংশই এই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত মতবিরোধ চলাকালে ১৯৫৪ সালের ২৫ অক্টোবর পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রথম গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন [৩]। স্বাধীনতা লাভের পর সংবিধান প্রণয়ন এবং আইন পরিষদ গঠনের জন্য গণপরিষদ গঠন অপরিহার্য ছিল। সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম গণপরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত আদর্শ প্রস্তাবটি সার্বজনীনতা হারায়। কারণ আদর্শ প্রস্তাবটি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে মতামত দেয়। পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ করলেও ইসলাম ব্যতিত অন্যান্য ধর্মের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির দাবি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রণয়ন করা। সাংবিধানিক বৈষম্যের পাশাপাশি আঞ্চলিক বৈষম্য ও মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট সমূহে প্রতিফলিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে গভর্ণর কর্তৃক প্রথম গণপরিষদ বাতিল ঘোষিত হয়।

১৯৫৫ সালের ২৯ মে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন মোট ৮০ জন সদস্য নিয়ে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের মারিতে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সম্বন্ধে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় – যা মারি চুক্তি নামে পরিচিত [৩]। নিম্নে দ্বিতীয় গণপরিষদে দলীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

টেবিল ০১ : পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদের দল ও আসন সংখ্যা।

দল	**আসন সংখ্যা**
মুসলিম লীগ	২৬
ইউনাইটেড ফ্রন্ট	১৬
আওয়ামী লীগ	১৩
নুন গ্রুপ	৩
পাকিস্তান কংগ্রেস	৪
সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন	৩
ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি	২
স্বতন্ত্র মুসলিম	১
অন্যান্য	১২

উৎস : *Ahmed, Moudud (1976), Bangladesh Constitution Quest for Autonomy, Dhaka: UPL, p. 39.*

দ্বিতীয় গণপরিষদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত মারি চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের সর্বপ্রথম সংবিধান গৃহীত ও কার্যকরী হয়। এই সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় গণপরিষদ সাংবিধানিক কাঠামো বিনির্মাণে পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্য গঠন করতে সক্ষম হয়। সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে মারি চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধান পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্বতির সরকার ব্যবস্থার সূচনা করে। এই সংবিধান প্রবর্তনের পিছনে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট ছিল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভার সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কয়েকটি বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচনী ফ্রন্ট। ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্ট ঘোষণা করা হয় [৭]।

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলসমূহ হচ্ছে – আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩), মওলানা আতাহার আলীর নিজাম-ই-ইসলাম এবং হাজী মোহাম্মদ দানেশের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রী দল। মধ্যপন্থী, গণতন্ত্রী, ইসলামী, বামপন্থী ইত্যাদি দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের মূল নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক,

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং সেই সময়ের তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন এবং পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি প্রধান দাবীতে পরিণত হয় [৩]। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের মাপকাঠি। এ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে *Ahmed Kamal Gi State Against the Nation* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "Sixty percent of the twenty million voters voted and the result was a complete disaster for the league: it only won ten seats out of the 237 Muslim seats in the Provincial Assembly. All its leaders lost their seats. Even the Prime Minister was defeated by a relatively unknown student leader in his home constituency." নির্বাচনে বিরোধী দলীয় জোট যুক্তফ্রন্ট এককভাবে ২১৫টি আসন লাভ করে। নির্বাচন পরবর্তীকালে আর ৮টি আসন ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত হলে যুক্তফ্রন্টের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৩। খেলাফতে রব্বানী পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩টি আসন লাভ করে [৭]। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্যে দিয়ে পূর্ববাংলায় ব্যাপক জনমতের প্রতিফলন ঘটে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে করা হয়। নিম্নে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফলের চিত্র দেওয়া হলো।

টেবিল ০২: ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল।

দল	আসন সংখ্যা
মুসলিম আসন সংখ্যা ২৩৭	যুক্তফ্রন্ট – ২২৩ মুসলিম লীগ – ১০ স্বতন্ত্র – ৩ খিলাফতে রব্বানী – ১
অমুসলিম আসন সংখ্যা ৭২	কংগ্রেস – ২৪ যুক্তফ্রন্ট – ১০ তফসিলী ফেডারেশন – ২৭ কমিউনিস্ট পার্টি – ৪ গণতন্ত্রী দল – ৩ বৌদ্ধ – ২ খৃস্টান – ১ স্বতন্ত্র – ১

উৎস : *Chowdhury, Najma (1980), The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-1958, Dhaka: University of Dhaka, p. 172.*

পূর্ববাংলার গভর্ণর চৌধুরী খালেকুজ্জামানের আমন্ত্রণে ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ৫৬ দিনের মধ্যে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হয়। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ববাংলায় পার্লামেন্টের ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টভুক্ত বিরোধী দলগুলি প্রাদেশিক পরিষদে সরকারি দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিরোধী দলের আসনে অধিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ।

পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রথম দশকে পূর্ব বাংলার দু'টি সংসদীয় সভা যথাক্রমে ১৭১ এবং ৩০৯ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এ সময়ে মুসলিম লীগের একচেটিয়া মনোভাবের কারণে ১৯৪৭-১৯৫৪ পর্যন্ত পূর্ববাংলার আইনসভার কাঠামো ছিল দুর্বল। সরকার নিয়ন্ত্রিত সংসদে স্পীকারও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হননি। ১৯৫৪ সালে গঠিত সংসদ কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের কারণে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। এই পরিষদের ৭৮ কর্ম দিবসে মাত্র ৬৮টি আইন অনুমোদিত হয়। সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বসহ অন্যান্য সংসদীয় অধিকারের প্রয়োগ ছিল অপর্যাপ্ত [৪]। নিম্নে সংসদে সময় বণ্টনের শতকরা হার দেখানো হলো।

টেবিল ০৩ : সংসদে সময় বন্টনের শতকরা হার।

বিবরণ	প্রথম পরিষদ	দ্বিতীয় পরিষদ
আইন প্রণয়ন	৩৮	১০
বাজেট	৩০	৪৩
প্রশ্নোত্তর	২২	২৬
মুলতবি প্রস্তাব	২	৬
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসহ অন্যান্য	৪	৩
পয়েন্ট অফ অর্ডার, তথ্য এবং স্পীকারের রুলিং	২	৭
অন্যান্য বিষয়াবলী	২	৫
মোট	১০০	১০০

উৎস : *Chowdhury, Najma (1980), The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-1958, Dhaka: University of Dhaka, p. 266.*

১৯৫৪ সালের সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য এবং সহনশীলতার অভাবে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক চরম অবনতিশীল পর্যায়ে উপনীত হয়। সরকার ও বিরোধী দলের এইরূপ বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক এক পর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয় যার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন ডেপুটি স্পীকার শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন এবং পরে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় পরিষদে সংসদীয় আচরণবিধিতে সংশোধন আনয়ন করা হলেও সংসদীয় কার্যক্রমে এর প্রভাব পড়েনি। সংসদে দলগুলোর মধ্যে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে সংসদ কার্যকর হতে পারেনি। এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে, "The dominance of the Muslim League and the attitude of the government during 1947-1954 did not allow the assembly to assert itself. Fragmentation of the parties, ministerial instabilities and the instances of suspension of parliamentary government during 1954-1958 prevented the legislature from acquiring a strong and vigorous existence" [৪]।

পাকিস্তানের প্রথম দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতার আবর্তে কেন্দ্র ও প্রদেশে প্রতিনিয়ত সরকারের পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত অব্যাহত থাকে। ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণীত হওয়ার পরও তা লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্র ও প্রদেশে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও তা কার্যকরী হতে পারেনি। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ডে সংসদীয় রীতিনীতি চর্চার ইতিবাচক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। পূর্ববাংলার আইনসভার সদস্যদের আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The behaviour of the second assembly was, on the whole, disorderly and unruly and on occasions utterly unpredictable" [৭]। সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি থাকাটা প্রয়োজনীয়। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বিরোধী দল তাদের অবস্থানকে সুসংহত করতে পারেনি। এই কারণে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "True, the opposition was not in a position to make the M. L. Government behave properly, either in the centre or in the provinces" [৮]। নিম্নে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের একটি চিত্র দেখানো হলো।

টেবিল ০৪ : পূর্ববাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদ।

আইন পরিষদ/সংসদ	যে আ ইন/সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত	সদস্য সংখ্যা	সদস্যের প্রকারভেদ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য/পাশকৃত আইন
পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ১৯৪৭ -১৯৫৪	১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।	১৭১	১৪১ জন অবিভক্ত বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচিত সদস্য। বাকী ৩০ জন আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার নির্বাচিত সদস্য। ০২ জন নারী।	পাকিস্তানে আধুনিক সংসদীয় ব্যবস্থা শুরু।
পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ ১৯৫৪ -১৯৫৮	১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধিত (পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ) রূপ	৩০৯	১২ জন নারী	যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ।

আইন পরিষদ/সংসদ	যে আইন/সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত	সদস্য সংখ্যা	সদস্যের প্রকারভেদ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য/পাশকৃত আইন
পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ১৯৬২ -১৯৬৫	১৯৬২ সালের আয়ুবী সংবিধান	১৫৫	৫টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত	গণতন্ত্রের। পরিশোধের মেয়াদকাল ৫ বছর। এ.টি.এম. মোস্তফা সংসদ নেতা। আখতার উদ্দিন আহমেদ বিরোধী দলের নেতা। আব্দুল মালেক উকিল আওয়ামী লীগ গ্রুপের নেতা।
পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ১৯৬৫-?	১৯৬২ সালের আয়ুবী সংবিধান।	-	-	-

উৎস : *ফিরোজ, জালাল (২০০৩), পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ২২।*

১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কেন্দ্র ও প্রদেশের আইনসভা এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগকে অকার্যকর ঘোষণা করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোকে সরাসরি দায়ী করলেও সময়ের আবর্তে এ সময়টি ছিল পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের উন্মেষ কাল। সঙ্গত কারণেই সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলো সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। ইস্কান্দার মির্জার সামরিক শাসন জারির ২০ দিনের মধ্যে সেনা প্রধান আইয়ুব খান পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল করেন [৩]। এভাবে শামরিক শাসক কর্তৃক ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটে।

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পর ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ঘোষণা করেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থাধীনে পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে দেশের নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হয়। এদের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন বলে বিধান করা হয়। আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের পরোক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়াটি, উদারনৈতিক, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ব্যহত করে। এর ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান প্রণীত সংবিধান রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন করে। এই সংবিধানে এক-কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার আওতায় কেন্দ্র ও প্রদেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন করার কথা বলা হয়। সাংবিধানিক চিঠিতে যেকোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভার থাকায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন উপেক্ষিত হয়ে পড়ে [৩]। পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে জনদাবীর প্রেক্ষিতে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও সামরিক শাসনের কারণে তা রহিত হয়ে পড়ে। জেনারেল আইয়ুব খান তার শাসনকে প্রলম্বিত করতে মৌলিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব হাজির করে একটি ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী সৃষ্টি করেন। সেনা শাসক কর্তৃক এ ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে রাষ্ট্র পরিচালনায় ভিন্নমতের স্বাধীনতা চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়।

১৯৬২ সালের সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংসদীয় কাঠামোর অনুকরণে কার্যপ্রণালী বিধি এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব ও মূলতবি প্রস্তাবের মতো কিছু সংসদীয় বিধি রাখা হয়। এ সকল সংসদীয় বিধি মূলত নির্বাহী কর্মকাণ্ডের তদারকিতে অকার্যকর ছিল। ১৯৬২-১৯৬৫ কালীন সময়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা ৩৯টি সরকারি বিল ও ১টি বেসরকারি বিল অনুমোদন করে এবং প্রায় তিন হাজারের মতো প্রশ্ন উত্থাপনসহ নয়শ'র অধিক প্রস্তাবনা পেশ করে। এই আইনসভার মর্যাদা ও ক্ষমতা কেন্দ্রিয় আইন সভার অনুরূপ হলেও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের সংসদীয় বিতর্ক বা কমিটি কর্ম সম্পাদন রীতিমত আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হয়। সংসদে রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা থাকলেও সংসদের নিকট রাষ্ট্রপতির কোনো জবাবদিহিতা ছিল না [৪]। মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদীয় কার্যক্রম অকার্যকর হওয়ায় শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়-দফা কর্মসূচীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী জানান [৯]। এ প্রসঙ্গে *Dilara Choudhury Gi Constitutional Development in Bangladesh Stresses and Strains* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "Such a political order, according to the Bengali intelligentsia, could rectify the situation in which they suffered from acute economic deprivation and political domination" [১০]।

ছয়-দফার ন্যায় ছাত্র সমাজের এগার দফায় এবং ৮টি রাজনৈতিক দল কর্তৃক গঠিত (Democratic Action Committee) DAC এর কর্মসূচিতেও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির গোলটেবিল বৈঠকেও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অনুরূপ দাবী উত্থাপিত হয় [৩]। ছয়-দফা এবং সম্প্রসারিত এগার দফা ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন দাবীতে পরিণত হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ছয়-দফা ও এগার দফায় নির্বাচনী অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামী লীগ কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নিম্নে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

টেবিল ০৫ : পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল।

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	৭২.৫৭
ন্যাপ (মস্কোপন্থী)	৩৬	-	১.৮৩
ন্যাপ (পিকিং পন্থী)	১৫	-	.৩০
ইসলাম-পছন্দ দলসমূহ	৫১৫	১	১৭.৮৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১৩৯	১	৭.৭২
সর্বমোট	**৮৬৭**	**১৬২**	**১০০**

উৎস : হারুন-অর-রশীদ, বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, পৃ. ২৮২।

টেবিল ০৬ : পশ্চিম পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল।

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
পাকিস্তানি পিপল্স পার্টি (পিপিপি)	১১৯	৮১	৪২.২
মুসলিম লীগ (কনভেনশন) মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১৫৮	১১	১০.২
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৬৯	৭	১০.৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পি.ডি.পি.)	২৭	-	১.৮
জামায়াত-ই-ইসলামী	৭৯	৪	৬.৫
অন্যান্য ইসলামী দল	১৪৭	১৪	১০.২
ন্যাপ (মস্কোপন্থী) ন্যাপ (পিকিংপন্থী) আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১৯ ৪ ৯ ২২৩	৬ - - ১৫	১৮.৫
সর্বমোট	**৮৫৪**	**১৩৮**	**১০০**

উৎস: হারুন-অর-রশীদ, বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, পৃ. ২৮৩।

১৯৭০ সালের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ৮৮টি আসন পেয়ে পাকিস্তান পিপল্স পার্টি দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের স্থান লাভ করে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে কোন আসন পায়নি। এই নির্বাচনে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ তৃতীয় স্থান লাভ করে। মস্কোপন্থী ন্যাপ পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন না পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে ৬টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পাশাপাশি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

করে। আওয়ামী লীগের এই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কারণ ছিল ব্যাপক জন সমর্থন। নিম্নে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল একটি সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

টেবিল ০৭ : পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল।

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	সর্বমোট
আওয়ামী লীগ	২৮৮	-	২৮৮
পাকিস্তান পিপল্স পার্টি (পি.পি.পি.)	-	১১৪	১৪৪
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	-	২৪	২৪
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি)	১	২১	২২
কনভেনশনাল মুসলিম লীগ	-	২০	২০
মারকাজি জামায়াত-ই-ওলামা	-	১১	১১
জামায়াতে ওলামা (হাজরাভি)	-	৮	৮
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	-	৮	৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২	৪	৬
জামায়াতে ইসলাম	১	৩	৪
অন্যান্য	১	৪	৫
স্বতন্ত্র	৭	৫৩	৬০
সর্বমোট	৩০০	৩০০	৬০০

উৎস : *Chowdhury, G. W. (2011), The Last Days of United Pakistan, Dhaka: University Press Limited, p. 128.*

১৯৭০ সালের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ২৮৮টি আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে কোন আসন পায়নি। অনুরুপভাবে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পশ্চিম পাকিস্তানে ১১৪টি আসন লাভ করলেও পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন লাভ করতে পারেনি। এই নির্বাচনে উভয় দল আঞ্চলিক দলের স্বীকৃতি লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও মুসলিম লীগের অবস্থান ছিল তৃতীয়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালির প্রদত্ত নির্বাচনী রায় প্রত্যাখ্যাত হলে, নয় মাস ব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মলাভ ঘটে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, উচ্চপদস্থ বেসামরিক সরকারি কর্মচারীদের রাজনীতির উপর অনধিকার প্রভাব বিস্তার। প্রাদেশিক শাসন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং কেন্দ্র ও প্রদেশে মন্ত্রীসভার দ্রুত রদবদল। এছাড়া পাকিস্তানের সংসদীয় রাজনীতির কাঠামোয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ কোন্দল, আইনসভায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সন্দেহ প্রবণতা ও বিরোধিতাপূর্ণ সম্পর্ক পাকিস্তানের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার উপর ১৯৫৮ সালের সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটলেও উল্লিখিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকেও সামরিক হস্তক্ষেপের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়।

বাংলাদেশ পর্ব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, জাতির প্রতি তার দীর্ঘ অঙ্গীকার ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশে একটি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারী করেন। অস্থায়ী সংবিধান আদেশে বলা হয়, দেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন এর প্রধান। রাষ্ট্রপতি হবেন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন এমন একজন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন [৩]। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় উত্তরণকে নিঃসন্দেহে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন হিসেবে গণ্য করা হয়। নব্য স্বাধীন দেশে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের প্রেক্ষাপটে

জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে *Ali Riaz-Gi Inconvenient Truths about Bangladesh Politics* গ্রন্থে বলা হয়েছে “The promise of an inclusive democracy and a just society marked the beginning of the regime of Sheikh Mujibur Rahman (Mujib). Policies such as nationalization and pledges of land reforms were matched with socialist and egalitarian rhetoric, demonstrating the populist agenda of the regime” [১১]।

রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ ‘বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ’ (রাষ্ট্রপতির ২২ নম্বর আদেশ) জারী করেন। এই আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) হতে যেসকল গণপ্রতিনিধি সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ গণপরিষদ গঠিত হয় [১২]। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিন ব্যাপী এই অধিবেশনে কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট ‘খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি’ গঠন করা হয় [১৩]। ২৩ মার্চের বাংলাদেশ গণপরিষদ অধ্যাদেশের মাধ্যমে গণপরিষদ গঠণের উদ্দেশ্য ছিল গণপরিষদ কর্তৃক দ্রুত সংবিধান প্রনয়ণ করা। কেননা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধাণ প্রণয়নে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চরম মতরিরোধ দেখা দেয়। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এই বিষয়টি উপলব্ধি করে দ্রুত সংবিধান প্রনয়ণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

১৯৭২ সালের ১০ জুন খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির শেষ বৈঠকে সংবিধানের প্রাথমিক খসড়াটি অনুমোদন করা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় এমন রাজনৈতিক দলগুলো খসড়া সংবিধানের কঠোর সমালোচনা করে। এসব দলগুলোর মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্র ইউনিয়ন। এই সমস্ত দলগুলো গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, “বর্তমান গণপরিষদ ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামো আদেশের অধীনে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। এরা আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবী আদায়ের ম্যান্ডেট পেয়েছিল। অতএব সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নের কোন অধিকার এদের নেই। বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাশারও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের সমম্বয়ে গঠিত জাতীয় সম্মেলনে সংবিধান প্রণয়ন ও গণভোটের মাধ্যমে গ্রহণ করার আবেদন জানান। অপরদিকে খসড়া সংবিধানের প্রতি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর) যথেষ্ট নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে। কারণ সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মৌলিক অধিকারের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল [১৪]। খসড়া সংবিধান নিয়ে সমালোচনাকারী কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের দাবী ছিল সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সমম্বয়ে জাতীয় সম্মেলনে সংবিধান প্রনয়ন করা। সংবিধান প্রনয়ণে জাতীয় ঐক্যমতের গুরুত্ব থাকলেও এ সময়ে বামপন্থী দলগুলো সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম দাবী ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েম করা। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলনের দাবীকে কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় বিরোধী দলগুলোর দাবীকে আমলে নেয়নি।

রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার মধ্যে দিয়ে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান বিল গণপরিষদে পাশ করা হয় এবং তা ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয় [১৩]। ১৯৭২ সালে সংবিধানটি রচিত হলেও এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীর মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে ছয়-দফা এবং এগার-দফা কর্মসূচিতে সার্বভৌম সংসদ এবং সংসদীয় সরকার পদ্ধতির দাবী জনদাবীতে পরিণত হয়। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসেবে বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই সংবিধানের মাধ্যমেই বাংলাদেশে ওয়েস্ট মিনিস্টার পদ্ধতির সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সূচনা ঘটে। এ প্রসঙ্গে Moudud Ahmed-এর *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman* গ্রন্থে বলা হয়েছে, “The Constitution of Bangladesh envisaged a Westminister type of parliamentary system reflecting the aspirations of the people nurtured for nearly two decades. The Awami League’s commitment since its inception for the establishment of a real living democracy for which they struggled and suffered for so many years could now be fulfilled because of the absolute power of the government” [১৫]।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের দ্বিমত থাকলেও আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংবিধান প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়। তাছাড়া দ্রুত সংবিধান প্রণয়ন করার বিষয়টি জনদাবীতেও পরিণত হয়। এই জনদাবীর একটি ঐতিহাসিক ভিত্তিও রচিত হয়েছিল। সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই জনদাবী পূর্ণতা লাভ করে। সংবিধান প্রণয়ন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল ও রিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ থাকতেই পারে। আবার দেশ ও জাতীর প্রয়োজনে উভয় দলের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার সুযোগও রয়েছে। সুতরাং জনউপযোগী যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে যদি পারস্পরিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্র সফলতা লাভ করতে পারে।

উপসংহার

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ পর্যায়সমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে বঙ্গীয় আইন সভাই ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের শুভ সূচনা করে। উপনিবেশিক আমলে বঙ্গীয় আইন সভার কার্যক্রম কর্তৃত্ববাদী মনোভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও এই সময়ে সরকার ও বিরোধীদলের সদস্যগণ তর্ক, বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও বিলের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া কেন্দ্র ও প্রদেশিক আইন সভায় সরকার ও বিরোধীদলের পারস্পরিক সহ-অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বঙ্গীয় আইন পরিষদে ১৯৩৭-১৯৪৬ সময়কালে সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্যগণ সংসদীয় রীতিনীতি পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। শুরুতে সংসদীয় কার্যক্রমের পরিধি সীমিত আকারে থাকলেও ক্রমান্বয়ে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৬ সালে সংবিধানেও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সামরিক শাসন ও রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে এর বিলুপ্তি ঘটে। পাকিস্তান আমলে স্বল্প সময়ের সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণে চরমভাবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলেও সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল গঠন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সেনানিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা বহাল ছিল। ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন হলেও সরকার ও বিরোধীদলের পারস্পরিক বিরোধিতায় জাতীয় সংসদ তার কার্যকারিতা হারায়। পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গীয় আইন পরিষদ, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের এবং বাংলাদেশ আমলের সংসদীয় কার্যক্রম সমূহে সরকার ও বিরোধী দলের কমবেশি পারস্পরিক সহ অবস্থান লক্ষ্য করা গেলেও সরকারিদল সমূহের উপনিবেশিক কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের কারণে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঐতিহাসিক পরম্পরায় গণতন্ত্রের এইরূপ সংসদীয় নেতিবাচক সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা আজও অনেকাংশে অকার্যকর।

তথ্য নির্দেশিকা

১. খান আরিফ (২০২১) বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা: বিএলবি

২. Chakraborty, Ratan Lal (1992), 'Sepoy Uprising 1857', Islam, Sirajul, ed., History of Bangladesh 1704-1971, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

৩. রশিদ, হারুন-অর (২০১৩), বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

৪. হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ (২০০৯), বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

৫. Rashid, Harun-or (2003), The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947, Dhaka: The University Press Limited.

৬. Islam, Syed Serajul, Bengal Legislative Assembly and Constitutional Development, Islam Sirajul, ed., op.cit.

৭. Chowdhury, Najma (1980), The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-1958, Dhaka: University of Dhaka.

৮. Harun, Shamsul Huda (1984), Parliamentary Behavior in a Multinational State, 1947-1958 Bangladesh Experience, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

৯. Maniruzzaman, Talukder (2003), Radical Politics and the Emergence of Bangladesh, Dhaka: Mowla Brothers.

১০. Chowdhury, Dilara (1995), Constitutional Development in Bangladesh Stresses and Strains, Dhaka: University Press Limited.

১১. Riaz, Ali (2013), Inconvenient Truths about Bangladesh Politics, Dhaka: Prothoma Prokashan.

১২. হক, মোজাম্মেল (১৯৭৬), ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭), ঢাকা: বুক হাউজ.

১৩. Jahan, Rounaq (2005), Bangladesh Politics: Problems and Issues, Dhaka: University Press Ltd.

১৪. হক, আবুল ফজল (১৯৯০), বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১৫. Ahmed, Moudud (1991), Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman, Dhaka: University Press Ltd.

১৬. Ahmed, Nizam (2002), The Parliament of Bangladesh, England: Ashgate Publishing Company.

১৭. হোসেন, শওকত আরা (১৯৯০), বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১-১৯৩৬, অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।